স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও ইসলাম

ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম

ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৩৮

১ম সংস্করণ

রজব	১৪১৮
অগ্রহায়ণ	১৪০৪
নভেম্বর	১৯৯৭

বিনিময় ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHAISTHO BIGGAN-O-ISLAM by Dr Ghulam Muazzam .
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.
Phone : 23 51 91

Price : Taka 10.00 Only.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
এক ঃ ঈমান	৭
দুই ঃ সালাত বা নামায	৭
তিন ঃ সিয়াম বা রোযা	৮
চার ঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার তাকীদ	১০
পাঁচ ঃ ইসলামের খাদ্যনীতি	১৩
ছয় ঃ ইসলামের পানীয় নীতি	১৫
সাত ঃ পুরুষের খৎনা	২১
আট ঃ মেয়েদের ঋতুস্রাব	২২
নয় ঃ মায়ের দুধ	২৪
দশ ঃ যৌন রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা	২৫
প্রমাণ পঞ্জি	২৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম

ইসলাম মানব জাতির জন্য একটি পরিপূর্ণ এবং একমাত্র জীবন ব্যবস্থা বা 'দ্বীন'। পাক কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف

"একমাত্র ইসলাম আল্লাহর স্বীকৃত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা (Code of Life)।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)

ইসলাম বলতে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য বুঝায় আর একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি লাভ সম্ভব—তাই ইসলামের আর এক অর্থ 'শান্তি'।

এই দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি হলো কালেমায়ে শাহাদাহ বা শপথ বাক্য ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

অর্থাৎ (ক) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই বা হুকুম দেয়ার অধিকারী নেই। এবং (খ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর প্রেরিত বা রাসূল।

এই শপথের মাধ্যমে একজন মু'মিন এই ওয়াদা করে যে, সে কেবল আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে এবং আল্লাহর এই আনুগত্য একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রদর্শিত পন্থায় বা তরিকায়ই করবে। অন্য কোন পন্থায় নয়। আর রাসূলের তরিকায় আল্লাহর আনুগত্যের নামই দ্বীন ইসলাম।

আল্লাহর সত্য ও একমাত্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ মহানবী (সা)-কে প্রেরণ করেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

"তিনিই (আল্লাহ) যিনি এই নবী [শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ]-কে প্রেরণ করেছেন তাঁর (আল্লাহর) হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ, যেন তিনি পৃথিবীর

যাবতীয় (বাতিল) জীবন পদ্ধতির উপর এই সত্য জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী করে প্রতিষ্ঠিত করেন, এতে সকল মুশরিকগণ যতই বিরোধিতা করুক না কেন।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩)

২৩ বছরের দীর্ঘ নবুয়তি জীবনের কঠোর ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে মহানবী (সা) তাঁর মহান দায়িত্ব পূর্ণ সফলতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) যেহেতু সর্বশেষ নবী তাই তাঁর পর এই দ্বীন কায়েমের দায়িত্ব গোটা মুসলিম উম্মাহর। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ .....

"(হে মু'মিনগণ !) এখন তোমরাই দুনিয়ার সর্বোত্তম দল যাদেরকে মানুষের (হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখো, আর আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান রক্ষা করে চলো। ....."

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

কিন্তু এই কাজ সফলতার সাথে করার জন্য মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে 'একামাতে দ্বীন' বা দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা (জেহাদ) চালাতে হবে। কারণ হুকুম দেয়ার ক্ষমতা অর্জন ব্যতীত দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবাইকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে তাই ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম বা বিধি-বিধানের বেলায় স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় শুধু ঐসব ইসলামী বিধি-বিধানসমূহের উল্লেখ করা হবে যেসব গুলোতে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক স্পষ্ট। ইসলামে স্বাস্থ্য বিধিগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, রোগ চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব আরোপ। বর্তমানে সকল বিজ্ঞানী স্বীকার করেন যে, Prevention is better than cure (রোগ প্রতিরোধ রোগ আরোগ্য করার চেয়ে উত্তম)। তাই ইসলামে Preventive medicine বা স্বাস্থ্য রক্ষা তথা রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রতি জোর দিয়েছে। বর্তমান আলোচনায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

পবিত্র কুরআনে দুই শতেরও অধিক আয়াতে এবং পবিত্র হাদীসেও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইসলামী হুকুম-

আহকামগুলো সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণের জন্য তবে এগুলো সরাসরি স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পালন করতে বলা হয়নি। ইসলামের সব হুকুম পালনই এবাদাত অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তবে এসব হুকুম পালনের ফলে দুনিয়াতেও অনেক কল্যাণ বা উপকার হয়ে থাকে যা এমনিতেই লাভ করা যাবে এর জন্য নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। ইসলামী হুকুম-আহকাম পালনের ব্যাপারে এই দিকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। তাই দুনিয়ার প্রয়োজনে সন্তান পালন প্রয়োজন কিন্তু একই কাজ আল্লাহর হুকুমে পালন করলে সওয়াব হাসিল হয় আর দুনিয়ার প্রয়োজনও পূরণ হয়।

এবার স্বাস্থ্য রক্ষামূলক ইসলামী বিধানগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

এক ঃ ঈমান

ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর উলুহিয়াত সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, জ্বরা, সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া হয় না এ বিষয়ে পূর্ণ একীন রাখা। এই বিশ্বাস দৃঢ় হলে রোগ হলেও মানুষ সবর-এখতিয়ার করতে পারে এবং এতে মানসিক কষ্ট অনেক কম হয়। পেরেশান হয়ে কোন লাভ হয় না এ বিশ্বাস থাকলে বিপদ-আপদে মানুষ ধৈর্যধারণ করে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে। তাই একজন ঈমানদার ব্যক্তি একজন আদর্শ রোগী। এজন্য বলা হয় যে, প্রশান্তিতেই মুক্তি এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা থাকলেই এই প্রশান্তি সম্ভব। অবশ্য ইসলামে সবর বলতে নিষ্ক্রিয় থাকা বুঝায় না। মানুষ সব অবস্থায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করবে। রোগ হলে চিকিৎসা করবে কারণ নবীজী (সা) বলেছেন ঃ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ অর্থাৎ প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে। তাই চিকিৎসা করা এবং রোগ মুক্তির জন্য গবেষণা করাও সওয়াবের কাজ। বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের প্রতীকে এই হাদীসখানা উল্লেখিত রয়েছে।

দুই ঃ সালাত বা নামায

ঈমান আনার পর প্রথম ফরয (অবশ্য পালনীয়) কাজ হলো নামায আদায় করা। সালাতে স্বাস্থ্য রক্ষার দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) অজু করা—কুরআনের নির্দেশ হলো নামাযের পূর্বে অজু করতে হবে। (সূরা আল মায়েদা ঃ ৬) এই অজুর মাধ্যমে শরীরের অধিক উন্মুক্ত অংশগুলো ভাল করে ধৌত করা হয়। সুতরাং অজুর মাধ্যমে হাত-পা, মুখমণ্ডল, মুখ-গহ্বর, নাক-কানের ছিদ্রসমূহ পরিষ্কার করা এবং মাথা মাসেহ করা রোগ প্রতিরোধমূলক কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া প্রয়োজন মত মিসওয়াক করা, কুলি করা, ইত্যাদিও স্বাস্থ্য রক্ষামূলক।

ফরয এবং সুন্নাত গোসলও স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক অথচ অজু-গোসল সবই করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

(খ) নামায আদায় করা—নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, রুকূ' দেয়া, রুকূ' থেকে উঠা, সেজদা দেয়া, সেজদার পর বসা, আবার উঠা ও বসা (দুই থেকে চার রাকায়াত পর্যন্ত) এসবই গোটা শরীরের জন্য মৃদু ব্যায়াম। সেজদার মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ইসলাম স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দিনে পাঁচবার ব্যায়াম করতে না বলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা বাধ্যতামূলক করেছে। নামাযের মাধ্যমে এই মৃদু ব্যায়াম স্ত্রী-পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ সবাই করতে সক্ষম এবং ইহা যোগ অভ্যাসের তুলনায় অনেক সহজ তাই সবার পক্ষে পালন করাও সম্ভব।

দুনিয়ার সরকারের সেনাদল রোজ সকালে একবার প্যারেড করে আর মুসলমানগণ আল্লাহর সেনাদল (হেজবুল্লাহ) বলে দিনে পাঁচবার প্যারেড করতে হয়। নামাযের মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষামূলক কল্যাণ লাভ হয় এতে কোনই সন্দেহ নেই। যাদের প্রয়োজন তাদের বেশী বেশী নফল নামায পড়ার অভ্যাস করা উত্তম। এতে অতিরিক্ত নির্দোষ ব্যায়ামও হয়ে যাবে।

তিন ঃ সিয়াম বা রোযা

প্রত্যেক সাবালেগ নারী-পুরুষ মুসলমানের জন্য বছরে এক মাস (রমযান মাসে) রোযা রাখা ফরয। কুরআনে বলা হয়েছে যে, সব জাতির জন্যই সিয়াম ছিল তবে একমাত্র মুসলমান জাতিই রমযান মাসে রোযা পালন করে থাকে। রোযা প্রকৃতপক্ষে উপবাস নয় বরং খাদ্য গ্রহণের সময়ের পরিবর্তন মাত্র। অমুসলিম এবং কোন কোন দুর্বল মুসলমান রোযায় শরীরের ক্ষতি হয় বলে সন্দেহ করে। এই সন্দেহ দূর করার জন্য ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত রমযান মাসে ঢাকা ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে রোযার বিভিন্ন দিক নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছি আমার কয়েকজন সহযোগীর সাহায্যে। এই গবেষণার

ভিত্তিতে দেশে বিদেশে অনেকগুলো গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছি। এই সমস্ত গবেষণায় সুস্থ শরীরে রোযায় কোন ক্ষতি তো হয়ই না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে উপকার লক্ষ্য করা গেছে। রোযার স্বাস্থ্যগত দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) সুস্থ রোযাদারদের মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতির লক্ষণ পাওয়া যায়নি। রক্ত চাপ, BMR, ECG, Blood Biochemistry সহ সবরকম পরীক্ষার ফলাফল স্বাভাবিক পাওয়া গেছে।(১)(২)

(খ) শতকরা প্রায় ৮০জনের শরীরের ওজন কিছু কমেছে। এই ওজন হ্রাসের পরিমাণ এক মাসে এক থেকে দশ পাউণ্ড, পর্যন্ত কিন্তু কোন রোযাদার এতে দুর্বলতার অভিযোগ করেননি। বরং বেশী ওজনের লোকদের অনেকে ওজন হ্রাসে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। প্রায় ১২% রোযাদারের ওজন এক থেকে চার পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাকি ৮% রোযাদারের ওজন স্থির থাকে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে শরীরের অতিরিক্ত ওজন (obesity) হ্রাসের জন্য নানারূপ চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে যার সবকয়টিই কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। রোযায় খুব ধীরে অল্প অল্প করে ওজন হ্রাস পায় তাই obese রোগীরা নফল রোযার মাধ্যমে সহজেই ওজন হ্রাস করতে পারে।(৩)

(গ) পাকস্থলির অম্লরসের উপর প্রভাব (Effect on Gastric Acidity) শতকরা প্রায় ৮০জন রোযাদারের বেলায় গ্যাষ্ট্রিক এসিড স্বাভাবিক পাওয়া গেছে। প্রায় ৩৬% অস্বাভাবিক এসিডিটি স্বাভাবিক (Normal) হয়েছে যা এসিড বেশী (Hyperacidity) বা কমা (Hypoacidity) উভয় অবস্থায়ই দেখা গেছে। প্রায় ১২% রোযাদারের এসিড একটু বেড়েছে তবে কারো ক্ষতিকর পর্যায়ে যায়নি।(৪) সুতরাং রোযায় পেপটিক আলসার হতে পারে এমন ধারণা ভুল এবং মিথ্যা। তাছাড়া পেট খালি থাকলে অম্লরস হ্রাস পায় আর পেপটিক আলসারে অম্লরস বৃদ্ধি পায়।

অবশ্য যদি কারো ক্ষতিকর আলসার থাকে এবং ক্ষুধা হলে ব্যথা বৃদ্ধি পায় তাহলে জোর করে রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط ....

"যে অসুস্থ অথবা ভ্রমণকারী সে রোযা না রেখে পরে কাজা করে নেবে .....।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

যে রোগে রোযা রাখা সম্ভব নয় এবং সফরে রোযা রাখা কষ্টকর হলে সে সময় রোযা না রেখে পরে সুস্থ হয়ে বা বাড়ী ফিরে যে কয়দিন রোযা ভেঙ্গেছে সে কয়টি রোযার কাজা আদায় করতে হবে। এই আইনও স্বাস্থ্যনীতি ভিত্তিক।

(ঘ) রোযার সেহরি, তাড়াতাড়ি ইফতার করা এবং পেট ভরে খেয়ে দীর্ঘ তারাবিহের নামায সবই স্বাস্থ্য রক্ষামূলক।

(ঙ) রোযার হুকুম-আহকাম যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত তার আরো উদাহরণ ঃ

(১) নাবালক হলে রোযা ফরয নয়। কারণ দীর্ঘ উপবাসে শিশুদের স্বাস্থ্যহানী হতে পারে।

(২) ঋতুবতি নারী ও সন্তান প্রসবের পর স্রাবকালে রোযা রাখা নিষেধ। এ সময় প্রচুর রক্তক্ষরণে শরীর দুর্বল থাকে।

(৩) গর্ভবতী নারীর সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে এবং দুগ্ধবতি মায়ের বুকের দুধ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি রয়েছে।

(৪) রোযা চান্দ্র বছর অনুযায়ী রাখতে হয় বলে রোযার মাস বিভিন্ন ঋতুতে পড়ে। এর ফলে যে কোন দেশে ভাল-মন্দ, শীত-গ্রীষ্ম এবং ছোট ও লম্বা দিন সব অবস্থায় রোযা রাখার সুযোগ হয়। সৌর মাস অনুসরণ করলে কোন দেশে জীবন ভর কঠিন গরম বা শীতে রোযা রাখতে হত। সুতরাং এটা একদিকে বিশ্বজনীন আর একদিকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানভিত্তিক।

চার ঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার তাকীদ

কেবল অজু-গোসলই নয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর মহানবী (সা) যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন যার সবকয়টিই রোগ প্রতিরোধমূলক বিধান যদিও এসবই করা হবে সওয়াবের উদ্দেশ্যে।

মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

(١) الطهور شطر الايمان (مسلم)

(১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।-(মুসলিম শরীফ)

(٢) مفتاح الصلوة الطهور (ترميذى)

(২) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সালাতের চাবি।-(তিরমিজী)

(৩) পবিত্রতা ইসলামের অঙ্গ।-(ইবনে হাইয়ান)

(৪) পরিচ্ছন্নতা ঈমানের দিকে আকর্ষণ করে আর ঈমান বেহেশতে প্রবেশ করায়।-(আল তাবরানী)

এছাড়াও মহানবী (সা) শরীর, বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি সবকিছু পরিষ্কার রাখার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি ঘরে থুথু ফেলতে বিশেষ করে নিষেধ করেছেন। প্রয়োজনে থুথু রুমালে বা কাপড়ে ফেলে পরে ধুয়ে নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। এসবই আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত উপদেশ।

যাদের মুখে বা ফুসফুসে রোগ বীজানু রয়েছে (যক্ষার বীজানু, ষ্ট্রেপটো বা ষ্ট্রেফাইলো কক্‌কাই বা ভাইরাস ইত্যাদি) থুথু ছুড়ে ফেললে তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিকটবর্তী লোকদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

(৫) মহানবী (সা) প্রতি সপ্তাহে হাত-পায়ের নখ কাটা, মাথার চুল ও দাড়ি আচড়িয়ে বিন্নস্ত রাখা, গোঁফ ছোট রাখা এবং রোজ দাঁত মাজার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

হাতের নখ বড় থাকলে এর মাধ্যমে রোগ বীজানু খাবার সময় মুখে প্রবেশ করতে পারে। দাঁড়ি রাখা মহানবীর (সা) সুন্নাত। দাঁড়ি পুরুষের পরিচয়দানকারী (Secondary Sexual Character) তাই সকল ধর্মেই দাঁড়ি রাখার নিয়ম রয়েছে। তবে ইসলামে দাঁড়ি সুবিন্নস্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার বিশেষ তাকীদ দেয়া হয়েছে। অতি দীর্ঘ এবং জটার মতো আবর্জনার জঞ্জাল করা নিষিদ্ধ। রোজ রোজ দাঁড়ি কামানো সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত নয় আর এতে অর্থ এবং সময় নষ্ট হয় তাতেও সন্দেহ নেই।

বড় গোঁফ খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে রোগ জীবানু মুখ গহ্বরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। উভয় ঠোঁট ঢেকে ফেলে এমন গোঁফ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যনীতি বিরোধী এবং নোংরা অভ্যাস। খাবার সময় এই লম্বা গোঁফ মুখে যাওয়া আসা করে আর ডাল-ভাত-তরকারী খেতে অভ্যস্ত বাঙ্গালী হলে তার গোঁফ হলদে হয়ে যায় যা দেখতে অশোভনীয়।

চুল দাঁড়ি আচড়িয়ে বিন্নস্ত রাখার জন্য মহানবী (সা) সঙ্গে চিরুনী রাখতেও পরামর্শ দিয়েছেন।

মহানবী (সা) ছেড়া বা তালি দেয়া পোশাকে আপত্তি করতেন না কিন্তু অপরিষ্কার বা ময়লা পোশাক খুব নাপসন্দ করতেন এবং পরিষ্কার পোশাক পরিধানের জন্য বিশেষ তাকীদ দিতেন।

(৬) এস্তেনজা তথা মল-মুত্র ত্যাগের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরও বিশেষ জোর দিয়েছেন। মলত্যাগ, করে প্রথমে কুলুখ (বর্তমানের Toilet paper—পূর্বে মাটির ঢেলা) নিতে বলেছেন এবং পরে পানি দিয়ে গুহ্যদ্বার ধৌত করতে পরামর্শ দিয়েছেন। এটাও স্বাস্থ্য বিধিসম্মত। মলের সঙ্গে রোগ বীজানু থাকে যা মলদ্বারের বাইরে লেগে থাকলে হাত ও পোশাকের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। পেশাবের পরও একই কথা। এরপর ব্যবহৃত হাত (বাঁহাত) ভাল করে ধৌত করারও উপদেশ দেয়া হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকার ন্যায় পানির বদলে শুধু টয়লেট পেপার ব্যবহার স্বাস্থ্যবিধি বহির্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নাই। তারা যদিও সাধারণত হাতে খাদ্য গ্রহণ করে না তবে অধৌত বাঁ হাতেই রুটি ও কেক ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

মলত্যাগ করে তিনবার কুলুখ নিতে বলা হয়েছে এবং শীত ও গ্রীষ্মে এগুলোর ব্যবহার পদ্ধতি ও বাতলিয়ে দিয়েছেন মহানবী (সা)। শীতকালে অণ্ডকোষ কুঞ্চিত থাকে তাই এ কুলুখ সামনে থেকে পেছনে বা পেছন থেকে সামনে টানলে চলবে কিন্তু গ্রীষ্ম কালে অণ্ডকোষ ঝুলন্ত থাকে বলে প্রথম কুলুখ সামনে থেকে পেছনে টানবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে নতুবা মল অণ্ডকোষে লেগে যেতে পারে। সুবহান-আল্লাহ-কি দূরদৃষ্টি !

পুরুষের মুত্র নালী বাংলা 'দ' অক্ষরের মত বলে কয়েক ফোটা পেশাব নালীতে থেকে যায় তাই পেশাব করে কয়েক কদম হাটতে বা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। যাতে সেই আটকানো পেশাবের ফোটা বের হয়ে যায়। এ জন্য কুত্ দিতে ও কাশি দিতে পরামর্শ রয়েছে। Toilet paper জড়ায়ে কিছুক্ষণ হাঁটলে সহজেই সেই শেষ পেশাবের ফোঁটা বের হয়ে আসে। তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এ সমস্ত Anatomy তথা শরীর বিদ্যার কথা বলায় প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা) অহির মারফতে সব জানতে পারতেন। কারণ Anatomy মাত্র কয়েক শতাব্দীর বিজ্ঞান।

(৭) রোজ সম্ভব হলে কয়েকবার দাঁত ব্রাশ করা বা মেস্ওয়াক করাও মহানবীর (সা) সুন্নাত। এ যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদি কেউ মহানবীর (সা) সময়কার মত গাছের ডালকে দাতন হিসেবে ব্যবহার করে আবার যদি কেউ নরম Tooth brush ব্যবহার করে দুইই স্বাস্থ্যসম্মত, তবে শক্ত টুথব্রাশ মাড়ির জন্য ক্ষতিকর। কয়লা বা গুড়া ঔষধ জাতীয় কিছু দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের ফাঁকে এসব আটকে থাকার সম্ভাবনা।

(৮) দাঁতের ফাঁকে খাদ্য দ্রব্য আটকে থাকলে খেলাল (Tooth-Prick) দিয়ে পরিষ্কার করাও ইসলামী নিয়ম। আজকাল Floss জাতীয় প্লাষ্টিকের তার দিয়ে খেলালের কাজ করা হয়। উভয় জিনিসের ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মাড়ির কোন ক্ষতি না হয় বা কোন আঘাত না লাগে।

(৯) বগল ও নাভির নীচের লোম কামিয়ে ফেলা ঃ বয়স্ক নারী-পুরুষের বগল ও নাভীর নীচে যৌনাঙ্গের চার পাশে লোম গজায়। এগুলো বড় হলে ময়লা জমে, চর্মরোগ ও বিশেষ ধরনের উকুন হতে পারে। মহানবী (সা) মাঝে মাঝে এসব লোম পরিষ্কার করতে বা কামিয়ে ফেলতে পরামর্শ দিয়েছেন যা সম্পূর্ণ রোগ প্রতিরোধমূলক।

পাঁচ ঃ ইসলামের খাদ্যনীতি

শরীর সুস্থ রাখতে হলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا ....

"হে মানুষ ! পৃথিবীর সব হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর .... ।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮)

হারাম খাদ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

"আল্লাহ তোমাদের জন্য মৃত দেহ, রক্ত, শূকরের মাংস, যার উপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম নেয়া হয়েছে বা জবাই করা হয়েছে সব হারাম করে দিয়েছেন। কেউ যদি বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে কিন্তু বিদ্রোহী হয়ে বা সীমালংঘন করার উদ্দেশ্যে না হয় তবে তাতে কোন গুনাহ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৩)

মৃত প্রাণী ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ কারণ কোন বিষাক্ত বস্তু বা ক্ষতিকর রোগের ফলে এর মৃত্যু হতে পারে ফলে এর মাংস গ্রহণকারীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। এই বিধান সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত।

রক্ত বলতে প্রবাহিত রক্ত বা دَمًا مَّسفُوحًا বুঝায় (সূরা আল আনআম ঃ ১৪৫)। এটাও বিজ্ঞানসম্মত কারণ জবাই করার সময় যে রক্ত বের হয়ে যায় তাই প্রবাহিত রক্ত এবং এতে দূষিত (Toxic) পদার্থ ও রোগ বীজানু থাকার সম্ভাবনা সর্বাধিক। তাই এই রক্ত খাদ্য হিসাবে নিকৃষ্ট। জবাই করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রক্তপাতের ফলে মস্তিষ্ক প্রায় রক্তশূন্য হয়ে যায় এবং প্রাণীটি বেহুঁশ হয়ে যায় এবং সে কোন রূপ কষ্ট পায় না। যেহেতু মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস তখনও কার্যকরী তাই প্রাণী সারা শরীর কুচকিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত প্রেরণ করতে চেষ্টা করে তাই পা ছুড়ে। যদিও দেখতে মনে হয় প্রাণীটি ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, আসলে তা নয় কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সে তখন বেহুঁশ। এই প্রচেষ্টার ফলে সারা শরীর থেকে দূষিত বা প্রবাহিত রক্ত বের হয়ে যায় কারণ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে পাম্প করলে ও জবাইর ফলে গলার সকল ধমনি ও শিরা কাটা বলে সব রক্ত বেরিয়ে যায় কিন্তু মস্তিষ্কে পৌছায় না। প্রাণীকে এক আঘাতে হত্যা করলে, বুলেটে মারলে বা বলি দিয়ে মস্তক আলাদা করলে বাকি রক্ত বের হবার উপায় নাই। জবাইর পরও ৬০ থেকে ৯০ সেকেণ্ড প্রাণীটি জীবিত থাকে এবং মস্তিষ্ক, হার্ট ও ফুসফুস কার্যক্ষম থাকে। সুতরাং জবাই দূষিত রক্ত বের করার সর্বোত্তম উপায় যা আল্লাহর হুকুমে ইয়াহুদি ও মুসলমানরা অনুসরণ করে থাকে। দূষিত রক্ত বের হয়ে যাবার ফলে গোশত বেশী উপকারী ও নির্দোষ হয় এবং জবাই করা গোশত বেশীক্ষণ ভাল থাকে। প্রকৃতপক্ষে জবাই করাই প্রাণী হত্যায় সবচেয়ে কম কষ্টদায়ক।

শূকর মাংস নিষিদ্ধ, কারণ আল্লাহর হুকুম। শূকর পুরোপুরি তৃণভোজী নয়। আর এর মাংসের মাধ্যমে দু' রকম কৃমি রোগ ছড়ায়। শূকর একটা নোংরা প্রাণী এবং এর যৌন জীবনও খুব নোংরা। তবে আল্লাহ এত হালাল খাদ্য দিয়েছেন যে একমাত্র শূকর মাংস হারাম হওয়ায় পেরেশান হওয়া অযৌক্তিক। এতে আরো অনেক অপকার থাকতে পারে যা হয়তো ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে। তবে শূকর মাংসভোজীদের যৌন জীবন খুবই নোংরা ও লজ্জাজনক তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমাদের যৌন ব্যভিচারের সঙ্গে শূকর মাংসের প্রভাব থাকলে অবাক হবার কথা নয়। তবে আল্লাহই ভাল জানেন।(৫)

আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে নিহত প্রাণী হারাম কারণ এ সরাসরি শের্ক। এছাড়া সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর গোশত, কঠিন আঘাতে নিহত প্রাণীর গোশত, উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাতে নিহত প্রাণীর গোশ্ত, শিংয়ের আঘাতে নিহত প্রাণীর গোশ্ত, যে

প্রাণীর কিছু অংশ কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে তাকে জবাই করার সুযোগ না পেলে সেই প্রাণীর গোশ্‌ত, যে কোন বেদীর উপর বলি দেয়া প্রাণীর গোশ্‌ত এবং তীর ছুড়ে ভাগ করা গোশ্‌তও হারাম। তীর ছুড়ে ভাগ করা এক ধরনের জুয়া যা আরব দেশে চালু ছিল এবং জুয়া হারাম বলে এভাবে ভাগ করা গোশ্‌তও হারাম। বাকি সবগুলোই নৃশংস হত্যা এবং যেহেতু মৃত প্রাণী হারাম, প্রাবাহিত রক্ত হারাম তাই এসব প্রাণী হয় মৃত না হয় তাদের প্রবাহিত রক্ত "দমে মাসফুহ" বের হয়নি তাই এদের গোশ্‌ত হারাম। এসব গুলোই চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত। এছাড়া সকল হিংস্রপ্রাণী (তৃণভোজী নয়) ও হিংস্র পাখিও হারাম। শাক-সবজি ও পানির মাছের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই তবে পানিতে মরা মাছও হারাম। এর কারণও বিজ্ঞান- সম্মত। এই মাছ কোন বিষক্রিয়া বা রোগে মরে থাকতে পারে তাই স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী পানিতে মরা মাছ নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য জিউল মাছ ভাল পানিতে মরে গেলে আলাদা কথা তবে সে মাছও মরে ভেসে উঠলে তাতে পচন ধরেছে বলে না খাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

খাওয়ার পূর্বে ভাল করে হাত ধোয়া, খাদ্য ও পানীয় সবসময় ঢেকে রাখা, খাওয়ার পর হাত ধোয়া, মুখ ধোয়া ও দাঁতের ফাঁকের আটকানো খাদ্য দ্রব্য দূর করা, পেট ভর্তি করে না খাওয়া বরং পেটের কিছু অংশ খালি রাখা, খাওয়ার মধ্যে পানি পান না করা, পান করার সময় পানিতে নিঃশ্বাস না ফেলা, ঘুম থেকে উঠে হাত ভাল করে না ধুয়ে (কারণ রাতে হাত কোথায় কোথায় গিয়েছে তার ঠিক নেই) কোন খাদ্য বা পানীয় স্পর্শ না করা নবীজীর উপদেশ এবং এর সবগুলোই স্বাস্থ্য বিধিসম্মত।

মহানবী (সা) আরো বলেছেন যদি কোন খাদ্যের অংশ দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে যা খিলাল দিয়ে বের করতে হয় তা খাওয়া নিষিদ্ধ। তবে ঠোঁট ও মাড়ির ফাঁকে আটকানো খাদ্য খেলে দোষ নেই। এটাও স্বাস্থ্য বিধিসম্মত কারণ দাঁতের ফাঁকে যে ময়লা জমে তাতে রোগ বীজানু থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দাঁতের ফাঁক থেকে বের করা খাদ্য ফেলে দেয়াই স্বাস্থ্যবিধি সম্মত। এমনিভাবে খাদ্য সম্পর্কিত প্রায় সকল বিধি-বিধানই স্বাস্থ্য নীতিসম্মত।

ছয় ঃ ইসলামের পানীয় নীতি

ইসলামে বিশুদ্ধ পানি, দুধ, ফলের রস, মধু ইত্যাদি সকল প্রকার উপাদেয় পানীয় হালাল। একমাত্র নেশাকর পানীয় মদ সম্পূর্ণ হারাম। এ বিষয়ে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ ! মদ, জুয়া, স্থাপিত মূর্তির সামনে বলি দেয়া ও তীর দ্বারা গোশ্‌ত ভাগ করা শয়তানের কাজ, সুতরাং এসব থেকে বিরত থাক যদি তোমরা সাফল্য লাভ করতে চাও।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৯০)

মদের অপকারিতা সম্পর্কে বর্তমানে সকল বিজ্ঞানী একমত তবু মুসলমান ছাড়া অন্য জাতি তাদের ধর্ম গ্রন্থে নিষিদ্ধ নয় বলে মদ নিষিদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড ও সুইডেন মদ নিষিদ্ধ করে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আল্লাহর দেয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাবে সেসব দেশে ব্যাপক চোরাচালান, ব্যাপক মাদকাশক্তি ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি পায়। ফলে ৭ থেকে ১২ বছরের মধ্যে এই আইন রহিত করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে একদল নীতিবান ব্যক্তি প্রায় একশত বছর মদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে ১৯১৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী ১৮তম সংশোধনী দ্বারা মদ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ হয় এবং ১৯২০ সালের জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়। কিন্তু এই আইন অমান্য চলতে থাকে গোপনে এবং ব্যাপক চোরাচালান (Smuggling) ও সন্ত্রাস এত বৃদ্ধি পায় যে, ১৯৩২ সালে ২১তম সংশোধনীর মাধ্যমে আবার মদ্য পানের অনুমতি দেয়া হয়। এ সমস্ত উন্নত দেশসমূহ মদ নিষিদ্ধ করতে ব্যর্থ হবার ফলে ইসলামের সফল পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।(৬)

আরব দেশে মহানবীর (সা) আমলে পাশ্চাত্য দেশগুলোর মতই মদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই মদ নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রথম আয়াত নাযিল হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط

"লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে (হে মুহাম্মাদ) মদ ও জুয়া সম্পর্কে। বলে দাও ঃ (মদ ও জুয়া) দু'টিতেই পাপ রয়েছে প্রচুর এবং মানুষের জন্য কিছু কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু এদের পাপ এদের কল্যাণের তুলনায় অনেক বেশী।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯)

মদের উপকারিতা বলতে অল্প পরিমাণ কিছু কেলোরি বা এনার্জি যোগাড় হয় তবে এতে কোন পুষ্টি নেই। খুব অল্প পরিমাণে মদ উত্তেজক বলে ধারণা

করা হতো যা এখন ভুল বলে স্বীকৃত। মদ্যপায়ী অনেক সময় হঠাৎ করে বেশী সাহসী বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে কিন্তু মদে তার মানবীয় সতর্কতামূলক গুণগুলো দাবিয়ে দেয় বলে নিজের যোগ্যতার সঠিক পরিমাপ করতে না পেরে বেশী বাহাদুরি দেখাতে চেষ্টা করে কিন্তু আসলে মদে কোন শক্তি বৃদ্ধিই করে না।

পানীয় হিসাবে মদের বলতে গেলে কোন উপকারই নেই। তবে ৭০% মদ দিয়ে রোগ জীবানু প্রতিরোধক হিসাবে ইনজেকশান দিবার পূর্বে চামড়া পরিষ্কার করা হয় এবং সার্জনরা হাত ধুয়ে মদ দিয়ে (৭০%) হাত ভিজিয়ে নেয়। কোন কোন বস্তুর জন্য মদ দ্রবণ হিসাবে এবং কোন জিনিসের নির্যাস (Extract) বের করতে মদের ব্যবহার হয়। এছাড়া অনেক কেমিক্যাল পরীক্ষায় মদের ব্যবহার রয়েছে। তাই আল্লাহ মদের উপকারিতা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তবে পানীয় হিসেবে এর উপকার উল্লেখযোগ্য নয়। খুব সামান্য মদ ক্ষুধা বাড়ায় বলা হয় কিন্তু কেউ মদের বেলায় অল্পে সন্তুষ্ট থাকে না—এটাও মদের স্বভাব। পানীয় হিসেবে মদের অপকারিতা অনেক। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া গেল ঃ

প্রথমত, মদের পরিমাণ ঠিক রাখা প্রায় অসম্ভব। তাই অনেকেই মদের পরিমাণ বাড়াতে থাকে। তবে তথাকথিত কম বা moderate dose-ও মদের ক্ষতিকর প্রভাব প্রকাশ করে। মাত্র দুই আউন্সই এ জন্য যথেষ্ট।

মদ অতি শীঘ্র মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে এবং তার প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে।

(১) মদ মনোযোগ নষ্ট করে এবং মস্তিষ্ক যে নির্দেশ দেয় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই নির্দেশ পালনে বিলম্ব করে। মদ খেয়ে গাড়ী চালালে দুর্ঘটনার জন্য এটাই বিশেষভাবে দায়ী। পথে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখলে মস্তিষ্ক যদি গাড়ীর ব্রেক চাপতে বলে, মদ খোরের বেলায় সে আদেশ পালন করতে এক সেকেণ্ড দেরী হয়ে যেতে পারে। একটা ৩০ মাইল (ঘন্টায়) বেগে গাড়ী সেকেন্ডে ৪৪ ফিট যায়। সুতরাং যদি $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ডও দেরী হয় তাতে ৪.৪ ফিট গাড়ীটি অনিচ্ছায়ও এগিয়ে গিয়ে বিপদ ঘটাতে পারে। তাই মদ খেয়ে গাড়ী চালানো অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য।

(২) মদের ফলে বিচার শক্তি, চিন্তাশক্তি লোপ পায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করার শক্তি কমে যায়। তাই বেশী বেশী কথা বলে এবং লজ্জাজনক কাজ ও ব্যবহার করতে লজ্জিত হয় না।

(৩) অল্প মদে পেটের অম্লরস বাড়ে কিন্তু বেশী মদ পান করলে প্রদাহ হয় ও বমি হয়। ফলে খাবার সব বেরিয়ে আসে এবং মদখোর পুষ্টিহীনতায় ভুগে।

(৪) মদ যকৃতের ভীষণ ক্ষতি করে এবং দীর্ঘদিন মদ পানের ফলে যকৃতের সিরোসিস (Cirrhosis) হয় যা মারাত্মক ব্যধি। এছাড়া একিউট হেপাটাইটিসও হতে পারে। এদের প্রায়ই Fatty liver হয়। তাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

(৫) অতিরিক্ত মদপানে চোখের দৃষ্টি তাৎক্ষণিকভাবে ঘোলা হতে পারে এবং মাতাল ড্রাইভার কর্তৃক দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্য এটাও দায়ী। এরা সবকিছু ঘোলা কাঁচের মত অস্পষ্ট দেখে।

(৬) Alcoholism বা পাড় মাতাল–এরা ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি লোপ ও মানসিক রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

(৭) সমাজে বেশীর ভাগ অপরাধ এসব মদখোরদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। মেক্সিকোতে এক বিশেষ গবেষণায় দেখা গেছে যে, মদের ফলে (ক) প্রতি ৩৭ মিনিটে একজন সন্ত্রাসের শিকার (খ) প্রতি ৮০ মিনিটে একজনের হত্যা, (গ) প্রতি ২০০ মিনিটে একজন মহিলা আক্রান্ত (ঘ) প্রতি ১২ মিনিটে একটি অপরাধ সংঘটিত, (ঙ) প্রতি ৪৭ মিনিটে একটি চুরি এবং (চ) প্রতি ৮ ঘন্টায় একটা সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

লণ্ডনের এক বিবরণে পাওয়া যায় যে, ৫১জন মদখোরের মধ্যে ৪৭জন মাতলামির জন্য গ্রেফতার হয়েছে এবং এদের ৪০জন জেল খেটেছে এবং ১৯জন দশবারের বেশী জেল খেটেছে। যেসব দেশে মদের প্রচলন বেশী সেসব দেশেই $\frac{১}{২}$ থেকে $\frac{৩}{৪}$ ভাগ অপরাধ আত্মহত্যা, মানসিক ব্যধি, দারিদ্র্য, যৌন ব্যভিচার ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য দায়ী মদের প্রভাব। আমাদের দেশে আজকাল যে রাহাজানি ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে তার মূলে ইসলাম বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং মদ ও নেশাকর বস্তুর প্রভাব রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(৮) বহু লোক মদের নেশায় সব খরচ করে দারিদ্র্যের শিকার হয় এবং পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয়, এমনকি পরিবার ভেঙ্গেও যায়।

ইসলামে মদ হারামের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এর কোন বিকল্প নেই। সেই পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

প্রথমে মহানবী (সা) মানুষকে এক আল্লাহর আনুগত্য ও পরকালে হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে শিক্ষা দেন। ঈমান আনার পর সবাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত হয় মাদানী জীবনে। এর পূর্বে মদের ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এ ব্যাপারে প্রথম আয়াত ছিল সূরা বাকারা ঃ ২১৯ (যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে)। এর ফলে অনেক বুদ্ধিমান সাহাবী মদ ছেড়ে দেন। কিন্তু তখনও মদ হারাম হয়নি।

তারপর নাযিল হলো ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ-

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাক তখন নামাযের কাছেও যেও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কি বলছো তা বুঝতে পারবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪৩)

এই আয়াত নাযিল হওয়ায় যারা নামাযে পাবন্দ তাদের পক্ষে মদ পান করে সম্পূর্ণ প্রকৃতস্থ হয়ে সময় মত জামায়াতে শামিল হওয়া কঠিন হয়ে পড়লো। ফলে আরও অনেকে নামাযের জন্য বাধ্য হয়ে মদ খাওয়া ছেড়ে দিল। সুতরাং নামাযকে মহব্বত করার পূর্বে এই আয়াত নাযিল হলে কোন কাজে লাগতো না। তাই আল্লাহ তাঁর মহান প্রোগ্রাম অনুযায়ী ব্যবস্থা করলেন।

এমনিভাবে যখন জনমত মদের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হলো এবং মদ যে খারাপ এ বিষয়ে মনে দৃঢ় প্রত্যয় হলো তখনই মদ হারামের স্পষ্ট আয়াত (সূরা আল মায়েদা ঃ ৯০) নাযিল হল এবং সঙ্গে সঙ্গে একদিনে গোটা মদীনা শহর মদ শূন্য হয়ে গেল যা আজও বলবৎ রয়েছে। শুধু তাই নয় আজও ইসলামের প্রভাবে (জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) মুসলিম জনপদগুলো মদের প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত এবং কোন মুসলিম দেশে মাতালদের সংখ্যা সমাজের বড় সমস্যা নয়।(৬)

সুনান ইবনে মাজার বিখ্যাত হাদীস অনুযায়ী মদের সাথে সাথে সবরকম নেশাকারী বস্তুই হারাম—ফলে আফিম, গাঁজা, কোকেন, হিরোইন ইত্যাদি যাবতীয় নেশাকর জিনিসই হারাম।

পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এখনও মদপান হ্রাস করার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তাতে কোন উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে না। এসব চেষ্টার কয়েকটি নমুনা দেয়া গেল ঃ

(১) Alcoholic Anonymous নামে একটি সমিতি মদের অপকারিতা দেখিয়ে কিছু লোককে মদ্যপান থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—যা ইসলাম দেখিয়েছে তা ছাড়া কোন ভাল ফল সম্ভব হচ্ছে না। এতে স্বভাবজাত কিছু ভাল লোক সাফল্য লাভ করে থাকে।

(২) একদল ভারতীয় সাধু T. M. (Transcendental Meditation) বা ধ্যান করে মদ থেকে বাঁচার পরামর্শ দিয়ে পাশ্চাত্য দেশে কিছু অনুসারী যোগাড় করেছে। এসব ধ্যান করে নাকি উচ্চ রক্তচাপ রোধ, উৎকণ্ঠা এবং মদ্যপান অভ্যাস দূর করা যায়। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে এখন সেসব দেশে যে কোন অদ্ভূদ জিনিসও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই লণ্ডনের রাজপথেও আজকাল টিকিধারী হলুদ ফতোয়া ও ধূতি পরা শেতাঙ্গ রাম ভক্তদেরকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। হিন্দু ধর্মে মদ নিষিদ্ধ নয়। তাদের শিব মদ-গাজা খেয়ে চক্ষু লাল করে থাকতো বলে বলা হয়। সোমরস তাদের ধর্মীয় মদ, সুতরাং হিন্দু সাধুর পক্ষে মদ ছাড়ার নিয়ম শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। যদি কোন মন্ত্র মনোযোগ দিয়ে বহুবার জপলে মানসিক শান্তি হয় তবে মুসলমানদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে কমপক্ষে রোজ ৩২বার সূরা ফাতেহা পাঠ ও ৩৩০বার আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করা নিসন্দেহে অনেক উন্নত T. M.। এসব সাধুরাও দেশে মদের অভ্যাস হ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছে।

(৩) Kesel এবং Walton এর গ্রুপ—সাইকোথিরাপিতেও কিছু উপকার হয় বলা হচ্ছে। এতে বেশ কয়েকবার অংশ নিতে হয়। যা বেশ সময় সাপেক্ষ।

(৪) Aversion therapy বা মদে অরুচি হয় এমন ঔষধ সেবনও কোন ফল দিতে পারেনি। এতে শুধু অতিরিক্ত খরচ বাড়ে।

(৫) যোগ অভ্যাসকেও এ কাজে ফলদায়ক বলা হয়। অবশ্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায অনেক সহজ ও ব্যাপক যোগ অভ্যাস যা নারী-পুরুষ ও বৃদ্ধরা পর্যন্ত করতে পারে।

মোটকথা সমাজে প্রথম থেকে মদের খারাবি সম্পর্কে অবহিত করলে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মদ তৈরী, আমদানী ও পরিবেশনা বন্ধ হলে এবং মদ যে হারাম এ শিক্ষা দিলেই মদ্যপান অভ্যাস দূর করা সম্ভব।

মাতালদের চিকিৎসার জন্য আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এদের জন্য মহানবী (সা) মধু পান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আধুনিককালে ডঃ লারসান (১৯৫৪) রোজ কয়েকবার ১২৫ গ্রাম মধু পান করতে দিয়ে যথেষ্ট উপকার পেয়েছেন।(৭)

মদ নিষিদ্ধ করা ছাড়া এই সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। তাই ইসলামের মদ নিষিদ্ধের আইন সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

পাক কুরআনে মধু সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ (মধুতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে)। তবে কোন্ কোন্ রোগের ঔষধ তা বলা হয়নি এবং নবীজীও বলে দেননি। মহানবী (সা) মাতাল ও কোন কোন রোগীকে মধু খেতে বলেছেন বলে জানা যায়। অনেকের ধারণা, যেসব রোগের কোন ঔষধ নেই তাতেই মধু উপকার করতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সম্প্রতি জনৈক ডায়েবেটিক রোগী স্বয়ং আমাকে বলেছেন যে, বেশ কয়েক মাস শুধু মধু পান করে তিনি ডায়েবেটিক রোগ মুক্ত হয়েছেন। অপর একজন রোগীর কথা আমার বিশেষভাবে জানা যে এই মহিলা অতিরিক্ত Steroid সেবনে (অতিরিক্ত রক্তস্রাবের জন্য) ডায়াবেটিস্ রোগে আক্রান্ত হন (Iartogenic) বা ঔষধের পার্শ্বক্রিয়ার ফল)। তিনি বার বছর যথারীতি Diabenol টেবলেট খেয়েছেন। গত এক বছর তিনি আমার পরামর্শে (সেই প্রথম ব্যক্তির বিবরণে আকৃষ্ট হয়ে) প্রায় এক বছর রোজ কয়েক চায়ের চামচ পরিমাণ খাঁটি মধু খেয়ে যাওয়ার পর সম্প্রতি তিনি সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত। রক্ত পরীক্ষা করে এটা প্রমাণিত। তাই মধুর কার্যকারিতা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালানো উচিত। এ বিষয়ে মুসলমান চিকিৎসকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাত ঃ পুরুষের খৎনা বা Circumeision

পুরুষের খৎনা ইসলামের অবশ্য পালনীয় সুন্নাত (আহমদ ও বায়হাকি) ইয়াহুদীদের জন্যও এই খৎনা অবশ্য পালনীয়। ঈসা (আ)ও এর জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কারণ তিনিও ইয়াহুদী ছিলেন ও মূসা (আ)-এর আইন অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। তবে সেন্টপল নামক এক পাদ্রী এই নিয়ম উঠিয়ে দিয়েছে।

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ জন্মের সময় একটি চামড়া দিয়ে আবৃত থাকে এবং একটি অংশ বাড়তি থাকে। এর নীচে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ভাজে অবস্থিত গ্ল্যাণ্ডের নির্যাস (Smegma) বের হয় এবং এতে ময়লা জমে তাতে নানারূপ প্রদাহ এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। তাই ইয়াহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে এই পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার প্রায় নেই বললেই চলে।(৮) খৎনা না হলে এই Smegma পুরুষাঙ্গে লেগে থাকতে পারে কারণ এদের মধ্যে পানি দিয়ে শৌর্চ করার অভ্যাসও কম। এই Smegma যে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে তা ইদুরের জরায়ুর অগ্রভাগে (Cervix) প্রবেশ করে প্রমাণিত হয়েছে।(৯) তাই মুসলমান ও ইয়াহুদীদের তুলনায় হিন্দু খৃষ্টান ও যারা খৎনা করে না তাদের Cancer Cervix (জরায়ু মুখের ক্যান্সার) বেশী হয়।(১০), (১১), (১২) ছাত্রকালে কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বহু হিন্দুর এই মারাত্মক রোগ দেখেছি। কিন্তু একটিও মুসলমানদের মধ্যে দেখিনি। বাংলাদেশে গত ৪২ বছরে একটি ক্ষেত্রেও মুসলমান পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার রোগী দেখিনি। খৎনার উপকারিতা বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী স্বীকৃত যদিও কোন কোন খৃষ্টান বিজ্ঞানী এই সত্য অস্বীকার করার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে কিছু পরিসংখ্যান উল্লেখযোগ্য। Nath and Gre wal (১৯৩৭)(১৩) খৎনা না করা ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে সবরকম ক্যান্সারের মধ্যে ১০% পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার পেয়েছেন। Cooray (1944)(১৪) শ্রীলঙ্কায় ১৩.৬% এবং Nagi (1933)(১৫) চীনে ১৮% পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার রিপোর্ট করেছেন।

সুতরাং খৎনা যে রোগ প্রতিরোধমূলক তাতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া বাচ্চা বয়সে খৎনা করার ফলে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ খোলা অবস্থায় পরিধানের কাপড়ের সংঘর্ষে কিছুটা স্পর্শকাতরতা হারায়। এর ফলে খৎনা করা পুরুষের যৌন মিলন তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা।

আট ঃ মেয়েদের ঋতুস্রাব

পাক কুরআনে ইহাকে সামান্য আঘাত বা অসুস্থতা বিশেষ বলা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج

"(হে মুহাম্মদ) লোকেরা আপনাকে মেয়েদের ঋতুকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন ঃ ইহা তাদের জন্য একটা অসুস্থতা বিশেষ, তাই এ সময়

তাদেরকে একা থাকতে দাও এবং যে পর্যন্ত না তারা পবিত্রতা অবলম্বন করে ততদিন তাদের সঙ্গে (যৌন মিলনে) মিলিত হয়ো না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২২)

এই বর্ণনা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। এ সময় মেয়েদের জরায়ুর মুখ (os uteri) কয়েক দিনের জন্য উন্মুক্ত থাকে যেন স্রাবের রক্ত বের হতে পারে। যদিও অন্য সময় ইহা ঘন আঠা জাতীয় বস্তু দিয়ে সিপির মত বন্ধ থাকে (mucus plug)। দুই স্রাবের মধ্যবর্তি সময় জরায়ুর ভিতরের দেয়ালের নবগঠিত অংশ সন্তান ধারণের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কিন্তু গর্ভধারণ না করলে তা পচে গলে স্রাব হিসাবে বের হয়ে যায়। তাই সেখানে অবশ্যই আঘাতের মত অবস্থা হয়। সুতরাং ঋতুস্রাবকে আঘাত বা অসুস্থতা বলা বৈজ্ঞানিক সত্য।

এ সময় সহবাস করলে জরায়ুতে রোগ বীজানু সহজে প্রবেশ করতে পারে। যার ফলে জরায়ু, ফেলোপিয়ান টিউব এমনকি তলপেটেও প্রদাহ হতে পারে (যেমন ঃ Endometritis, Salpingitis, Peritonitis and pelvic cellulitis)। এছাড়া এ সময়কার যৌন মিলনে সিফিলিস, গনোরিয়া ও এইড্‌স্ জাতীয় যৌন রোগও সহজে সংক্রমিত হতে পারে। সুতরাং ঋতুস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত যৌন মিলন নিষিদ্ধকারী কুরআনী আইন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া রক্তস্রাবের সময় যৌন মিলন একটা কুরুচী ও অশালীন ব্যাপার।

যদিও মেয়েদের ঋতুস্রাব একটি স্বভাবজাত ব্যাপার (Physiological) তবুও এ সময় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেমন তলপেটে ব্যথা এবং অস্বস্থিভাব (Shaw, 1948)।(১৬)

সম্প্রতি কুরআনের এই اذى বা সামান্য অসুস্থতা বিশেষ বলার সপক্ষে বিলেতে ডাক্তার ক্যাথারিন ডাল্টন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি একটি মেয়ে হোষ্টেলে তার গবেষণা পরিচালনা করেন। তার গবেষণার ফলাফল খুব উল্লেখযোগ্য। তার কয়েকটি প্রকাশিত প্রবন্ধের কয়েকটি বিষয় নিম্নে দেয়া হলো ঃ (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১)

(১) ঋতুস্রাবের সময়কালে মেয়েরা পড়াশুনায় কম মনোযোগী হয়, খেলাধুলা এড়াতে চেষ্টা করে এবং ক্লাসে বেশী বেশী কথা বলে। যারা

এমনিতেই দুষ্ট স্বভাবের ও অপরাধপ্রবণ, স্রাবের সময় তাদের দুষ্টমি ও অপরাধ আরও বেড়ে যায়।

(২) যে সমস্ত মেয়েদেরকে ক্লাস মনিটার নিয়োগ করা হয় তারা ছোট খাটো অপরাধের শাস্তি দেয়ার অধিকারী। এই মনিটারদের ঋতস্রাবের সময় তারা তাদের শাস্তির ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না, অনেক সময় বেশী শাস্তি দিয়ে ফেলে।

তাই ডাঃ ক্যাথরিন ডাল্টনের মতে মহিলা প্রশাসক ও বিচারক নিযুক্তি না হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। একই কারণে সেনাবাহিনীতে তাদের যোগ দেয়াও অযৌক্তিক বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

হাঙ্গেরিতে এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে (Erdelyi, 1960)(২২) যে ঋতুকালে মেয়েদের খেলা, স্পোর্টস, নৌকা বাইচ ইত্যাদিতে মান অনেক নীচে নেমে যায়।

সুতরাং ঋতুস্রাব সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সম্পূর্ণ সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ। সপ্তম শতাব্দীতে অবতীর্ণ কুরআনে এমন বিজ্ঞানভিত্তিক ঘোষণা সত্যিই বিস্ময়কর।

৯. মায়ের দুধ

এ সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔

"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু' বছর বুকের দুধ পান করাবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩)

স্তন ঝুলে যাবে, সৌন্দর্যের হানি হবে এমন অপপ্রচারের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের নকল করে আমাদের দেশেও বহুদিন বুকের দুধ না খাওয়াবার বদ অভ্যাস চালু রয়েছে। কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের এ ব্যাপারে গাফলতি নিতান্ত দুঃখজনক ও বড় গুনাহর কাজ তাতে সন্দেহ নেই।

বহু কোটি ডলার মূল্যের দুধের বোতল ও চুষনি বিক্রয় করার পর পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা এতদিনে তাদের ভুল ধরতে পেরেছেন তাই আবার বোতল বাদ দিয়ে মায়ের দুধ পান করাবার বিশেষ তাকীদ দেয়া হচ্ছে। এই ঢেউ বাংলাদেশেও

এসেছে। তবে কুরআনে আছে বলে নয়, সাহেবরা বলেছে বলে ! সত্যি এ লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। এ দেশের মুসলিম শিশু চিকিৎসকদের উচিত মায়ের দুধ খাওয়াবার তাকীদ দেয়ার সময় কুরআনী নির্দেশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া। তাহলে হয়তো কিছু গুনাহ মাফ হবে। বর্তমানে দেশের সর্বত্র, বিশেষ করে চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে মায়ের দুধ খাওয়াবার জন্য তাকীদ দেয়া বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ যে আল্লাহর হুকুম একথাটির উল্লেখ দেখা যায় না। যা হোক বহুদিন পর আল্লাহর হুকুমের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

মায়ের দুধ শিশুকে পান করার সঙ্গে স্তনের ক্যান্সার রোগের সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কে বিখ্যাত প্যাথলজিষ্ট Willis (1953)(২৩) লিখেছেন —"মায়ের গর্ভধারণের সঙ্গে স্তনের ক্যান্সার হওয়ার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যেসব মহিলা মোটেই গর্ভধারণ করে নাই অথবা গর্ভধারণ করলেও সন্তানকে বুকের দুধ পান করায়নি, তাদের স্তনের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বেশী।"

মনে হয় স্তনের ক্যান্সারের কোন এন্সার (answer) না পেয়েই পাশ্চাত্য এখন বুকের দুধের দিকে নজর দিয়েছে।

দশ ঃ যৌন রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ইসলামে বিবাহ একমাত্র স্বীকৃত যৌন মিলন ব্যবস্থা। ইসলাম স্বাভাবিক যৌন জীবনের প্রয়োজন পূর্ণভাবেই স্বীকার করে তবে কোন অবস্থাতেই বিবাহের বাইরে যৌন মিলনের অনুমতি দেয় না। শুধু তাই নয়, অবৈধ যৌন মিলনের জন্য কঠিন শাস্তি এবং এতে ভয়ানক গুনাহ হয় বলেও ঘোষণা দিয়েছে। এ ব্যাপারে এত কড়াকড়ির একমাত্র কারণ শান্তির পরিবার ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং সবরকম মারাত্মক যৌন ব্যধি থেকে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা।

এ বিষয়ে পাক কুরআনে আল্লাহর নির্দেশ ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

"তোমরা যিনার কাছেও যেও না, কারণ ইহা অত্যন্ত অশ্লীল ও লজ্জাজনক কাজ এবং গুনাহ যা বহু গুনার দ্বার খুলে দেয়।"–(বনী ইসরাঈল ঃ ৩২)

একথা যে কত সত্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যৌন ব্যভিচারের চির সাথী হলো নর-নারীর অবাদ মেলা-মেশা, বেপর্দা, অশ্লীল নাচ-গান, মদ্যপান,

জুয়া ইত্যাদি। তাই ইসলামে এ সবই নিষিদ্ধ। এবং এসব অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা মানে ব্যভিচারের সুযোগ সৃষ্টি না করা। আধুনিককালে জাহেলী যুগের মতই অবাধ যৌন মিলন পসন্দনীয়। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সমস্ত যৌন বিলাসিরাই প্রগতির নামে বেশী মুখর এবং খড়গহস্ত।

ইসলাম পর্দা ও সুস্থ যৌন জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বিভিন্ন মারাত্মক যৌন ব্যধি থেকে বেঁচে থাকা। কিন্তু শুধু এই রোগের ভয় মানুষকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করতে পারে না। কারণ মানুষ জেনে শুনেই এসব পাপ করে থাকে। তাই ইসলাম এ সঙ্গে ব্যভিচারকে কঠিন গুনাহ এবং পরকালে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেও ঘোষণা করেছে।

মারাত্মক যৌন ব্যধিগুলোর নাম—সিফিলিস, গনোরিয়া, হার্পেস এবং সর্বাধুনিক মারাত্মক ব্যধি AIDS (Aqured Immune Deficiency Syndrome—অর্জিত অপর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যধি)। এসবই ব্যভিচারের কুফল। লক্ষ্য করার বিষয় যে, যেসব দেশে পর্দার বালাই নেই, নর-নারীর ঘনিষ্ঠ মেলামেশা সহজ—সেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও ধন-সম্পদে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলোতেই এসব রোগ সর্বাধিক। সকল উন্নত দেশগুলোতে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশসমূহে অবৈধ যৌন মিলন সমাজে স্বীকৃতি লাভ করায় নানারূপ যৌন বিকার যেমন সমকামিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এসব সমকামীদের মধ্যেই সর্বপ্রথম AIDS (রোগ ধরা পড়ে। আজও বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সমকামী এবং AIDS রোগী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যায় যদিও এখন AIDS সবরকম লোকের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে এবং এর প্রধান কারণ যৌন অনাচার। মুসলমান জাতি যদিও এখন ইসলাম থেকে অনেক গাফেল তবুও ইসলামী সমাজের প্রভাবে এখনও সকল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে AIDS কোন বড় সমস্যা নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে সাবধান হতে হবে এবং ইসলামী মূল্যবোধকে বাড়াতে হবে নতুবা মহাবিপদ হতে পারে।(২৪) সিফিলিস-গনোরিয়ার ভাল চিকিৎসা আছে কিন্তু এই যৌন অনাচার বন্ধ না হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে এই সমস্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। সুতরাং রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে কেবল ঔষধ আবিষ্কারই যথেষ্ট নয়।

এমনিভাবে এখন যদিও AIDS -এর কোন ঔষধ বা প্রতিষেধক নেই কিন্তু এর ঔষধ আবিষ্কার হলেও যৌন অনাচার বজায় থাকলে AIDS রোগীর সংখ্যা বেড়েই যাবে। AIDS-এর ব্যাপারে মহানবীর (সা) সেই বিখ্যাত হাদীস

উল্লেখযোগ্য। মহানবী (সা) বলেন, "যেসব জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ব্যাপক এমনকি তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন লজ্জাও অনুভব করে না, তাদের মধ্যে মহামারী ছাড়াও এমন রোগ দেখা দেবে যা তাদের পূর্ব-পুরুষগণও কখনো দেখেনি।"–(ইবনে মাজাহ)

বর্তমানকালের AIDS রোগ এই হাদীসেরই বাস্তব প্রমাণ। সুতরাং ইসলামের যৌন ব্যভিচার রোধের ব্যবস্থাই এ ধরনের জঘন্য ও মারাত্মক যৌন ব্যধি রোধের একমাত্র উপায়।

সবশেষে আমার বক্তব্য যে ইসলামে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা রয়েছে যার কয়েকটি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে পেশ করা হল।

প্রমাণ পঞ্জি

১। Muazzam, M. G. and Khaleque, KA (1959) : Effects of Fasting in Ramadhan, J. Trop. Med. & Hyg. London, 62 : 292-294

২। Khaleque, KA, Muazzam, MG and Ispahani. P. (1960) : Further observation of the Effects of Fasting in Ramadhan. J. Trop. Med. & Hyg. 63 : 241-243

৩। Muazzam, MG, and Ali, MN (1967) : Effects of Ramadan Fasting on Body Weight, The Medicus, Karachi, 34(5) : 134-136

৪। Muazzam, MG, Ali, MN. and Husain, A. (1963) Observations on the Effects of Ramadan Fasting on Gastric Acidity, The Medicus. Karachi, 25 (5) : 228-233

৫। মুয়ায্‌যাম, মুহাম্মদ গোলাম (১৯৮৬) : কুরআনে বিজ্ঞান, হা-মীম পাবলিকেশান, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

৬। Muazzam, MG. (1985) : Medical Research And Al-Qur'an (Alcoholism, Gambling and Fasting). Ha-meem Publications, Dhaka, 1st edn, pp. 1-59

৭। Larson, M (1954) : Brit, Med. J. (August), quoted by Digir (1974) : Al-Assal, Dar al-Kutub, Al-Arabia, Damascus.

৮। Robbins, SL and Cortan, RS (1979) : Pathologic Basis of Discase, 2nd edn. W. B. Saunders Co. p. 1213

৯। Pratt Thomas, HR. Heins, HC, Latham, E, Dennis, EJ and Mc Iver FA (1956) : Cancer, 9 : 671

১০। Nath, V. and Grewal, KS (1939) : Ind. J. Med. Res. 26 : 785

১১। Gagnon F. (1950) Amer, J. obst & Gynae, 60 : 516

১২। Towne, JE (1955) : Amer J. obs & Gynae, 69 : 606

১৩। Nath V. and Grewal, KS (1937) : Ind. J. Med. Res. 24 : 633

১৪। Cooray GH (1944) : Ind. J. Med. Res, 32 : 71

১৫। Ngai, SK (1933) : The Etiological and Pathological Aspects of Squamous Cell Carcinoma of the Penis among the Chinese, Amer. J. Carcer. 19 : 259

১৬। Shaw, W. (1984) : Textbook of Gynaecology. Churchill, London, p. 106

১৭। Dalton, K. (1959) : Brit. Med. J. 1 : 148

১৮। — K. (1960) : Brit. Med. J. 1 : 326

১৯। — K. (1960) : Brit. Med. J. 2 : 1425

২০। — K. (1960) : Brit. Med. J. 2 : 1647

২১। — K. (1961) : Brit. Med. J. 2 : 1752

২২। Erdelyi, GT (1960) : Time, Dec. 12 issue New York, p. 40

২৩। Willis, RA (1953) : Pathology of Tumours, Butterworth, Lond. 2nd edn, pp 596-97

২৪। Muazzam, MG (1986) : Acquired Immune Deficiency Syndrome—AIDS and its Perspective in Bangladesh, Bangladesh J. Path. 1 (2) : 48-59

সমাপ্ত